বাংলার বাজেট—পুলিশ চোরাকারবারী ও মন্ত্রীদের

এই বাজেটের উদ্দেশ্য—জনস্বার্থ প্রতিষ্ঠা নয়, জনস্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী এম, এল, এ

সোস্যালিষ্ট ইউনিটী সেণ্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা | বুধবার, ৯ই জুলাই ১৯৫২, ২৫শে আষাঢ় ১৩৫৯ | মূল্য—এক আনা

জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত, পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৫২-৫৩ সালের বাজেট পেশ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় অর্থ দপ্তরের ভার গ্রহন করাতে তিনি নিজেই এই বাজেট উত্থাপন করেছেন। স্বভাবতঃই এই বাজেট বিভিন্ন দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের বহুদিনের আশা-আকাঙ্খা এই বাজেটে বিশেষভাবে স্থানলাভ করবে এটাই আশা করা গিয়েছিল কিন্তু এবারকার মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন ও বাজেট নিয়ে একটু সমালোচনা করলেই দেখা যাবে যে জনসাধারণের অর্থ নিয়ে যথেচ্ছাচার করা হচ্ছে, এককথায় ছিনিমিনি খেলা চলছে। কোন স্থানেই জনস্বার্থের বিন্দুমাত্র সংস্পর্শ নেই।

প্রথমে মন্ত্রিসভার কথাই ধরা যাক্। পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের মত গরীব দেশে এই প্রদেশে চোদ্দ জন মন্ত্রী ও ষোল জন উপমন্ত্রীর কি প্রয়োজন ছিল সেটা কোন বিবেচনা শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির বোধগম্য হচ্ছে না। যুক্তি দেখান হয়েছে যে, কাজ বেড়েছে অতএব মন্ত্রী সভার সদস্য সংখ্যাও বাড়ানো প্রয়োজন। "আর যেহেতু অর্থের বিনিময়ে সেবার পরিমান নির্দ্ধারণ করা যায় না সেইজন্য সদস্য সংখ্যা বাড়ালে দোষের কি আছে? কাজ কোন্‌দিকে বেড়েছে সেটা পরিস্কার ভাবে কিছু বলা হয়নি। কুখ্যাত লীগ আমলে বিশেষ করে ১৯৪৬ সালেও (যখন দেশজোড়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছিল) অবিভক্ত বাংলায় মন্ত্রী সংখ্যা ছিল ১১ জন। সেক্ষেত্রে অবিভক্ত বাংলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ বর্তমানের পশ্চিম বাংলায় শান্তিপূর্ণ সময়ে ৩০ জন মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর নিয়োগ কি বিশেষ কোন স্বার্থ প্রণোদিত নয়? এছাড়া পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী প্রভৃতি তো আছেই, যাদের সঠিক কোন সংখ্যা এখনও ঘোষনা করা হয়নি। মোটামুটি ভাবে হিসাব করলে দেখা যায় যে বছরে এদের পিছনেই ১৩ লক্ষ টাকার বেশী খরচ হবে। সুতরাং গরীব বাঙ্গালীর পক্ষে মন্ত্রী পোষা হাতী পোষারই সামিল হচ্ছে। যেখানে শ্রমিক সাধারণের ক্ষেত্রে কম লোক ও বেশী কাজের আদর্শ প্রচার করা হচ্ছে, যেখানে প্রতিটি কারখানায় Rationalisation এর খড়্গ নেমে আসছে, সেক্ষেত্রে জনসাধারণের সুস্পষ্ট অভিমতের বিরুদ্ধে মন্ত্রী সভার ওপর—ভারী কাঠামো (Top heavy structure) দাড় করানো হয়েছে। অবশ্য মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের যোগ্যতা স্থানাভাব বশতঃ এক্ষেত্রে আলোচনা না করাই ভাল, কেন না এমন কোন যোগ্যতাই নেই যার অধিকারী তাঁরা নন্।

এবারকার বাজেটেও ইংরেজ আমলের নকল করে প্রায় ৬ কোটি টাকা ঘাটতি দেখান হয়েছে। এই ঘাটতি দেখাবার একমাত্র উদ্দেশ্য, কি করে জনতার ঘাড়ে আরো করের বোঝা বাড়ান যায়, কি করে শোষণকে আরো পাকাপোক্ত করা যায়। জাতি গঠন খাতে যে সমস্ত খরচ দেখান হয় সেটা কোনদিনই সম্পুর্ণ খরচ হয় না, ফলে এত ঘাটতি পড়া অস্বাভাবিক। যেমন ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেটে গ্রাম্য ডিসপেনসারি ও হেলথ ইউনিটের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ৮০ লক্ষ টাকা; সংশোধিত বাজেটে তাকে কমিয়ে এনে দাঁড় করানো হল ৭১ লক্ষ ৪৫ হাজারে আর বাস্তবে খরচ করা হল ২৩ লক্ষ ৫২ হাজার ৮৩৪ টাকা এভাবে দেখান যেতে পারে যে বাজেটে যা বরাদ্দ হয় বা দেখান হয় তা হল শুধু কাগজ পত্রের হিসাব। জনতাকে ধাপ্পা দেবার চমৎকার উপায়।

বর্তমান বাজেটের মোট রাজস্বের পরিমান ৩৫ কোটি ৯১ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। এর শতকরা ২০·৩% ভাগ বরাদ্দ করা হয়েছে পুলিশী খাতে, ৩·১% ভাগ জেল ইত্যাদির খরচে এবং দপ্তরখানা পুষতে ৯·৯% ভাগ। অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৩৪ ভাগ খরচ হচ্ছে এই সমস্ত জঘন্য খাতে। এই সমস্ত বিভাগে খরচের পরিমান প্রতি বছর ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে বেড়েই চলেছে। নিচের হিসাব থেকেই সেটা পরিস্কার বোঝা যাবে।

পুলিশ খাতে:—

সাল	মোট টাকা
১৯৫০-৫১	৫,৩০,০৬,৪৭৫ (প্রকৃত খরচ)
১৯৫১-৫২	৫,৪৬,৩৪,০০০
১৯৫১-৫২ সংশোধিত	৫,৮৮,৫২,০০০
১৯৫২-৫৩ (বর্তমান বাজেট)	৬,০৫,০২,০০০ (বরাদ্দ)

জেল:—

সাল	মোট টাকা
১৯৫০-৫১	৯৭,১৫,৮৭৯ (প্রকৃত খরচ)
১৯৫১-৫২ (সংশোধিত)	৯৯,২৩,০০০
১৯৫২-৫৩ (বর্তমান বাজেট)	১০০,০৬,০০০ (বরাদ্দ)

দপ্তরখানা:—

সাল	মোট টাকা
১৯৫০-৫১	২ ১০,৪৫,৯২৫ (প্রকৃত খরচ)
১৯৫১-৫২ (সংশোধিত)	২,৪৬,৭৯,০০০
১৯৫২-৫৩ (বর্তমান বাজেট)	২,৫৪,৮৬,০০০ (বরাদ্দ)

জনস্বার্থবিরোধী পুঁজিপতি মালিক শ্রেণীর সরকার খুব স্বাভাবিক কারণেই জনসমর্থনের ওপর নির্ভর করতে পারে না। জনসাধারণের স্বার্থ না দেখলে যে তার সমর্থন পাওয়াও দুস্কর এটা কংগ্রেসী সরকার খুব ভালভাবেই জানে। শুধু তাই নয়—এর ফলে জনতা যে ক্রমশঃ গণআন্দোলনের পথে পা বাড়াবে সেটা জেনেই গণআন্দোলনকে দমাবার জন্য পুলিশী খাতে ক্রমশঃ খরচ বাড়ানো হচ্ছে—এছাড়া অন্য কোন কারণ নেই। এ বাজেটকে এক-নজরে পুলিশী বাজেট বলা চলে অন্য কোন আখ্যাই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। একথা যে কত সত্য সেটা এর পার্শে বিভিন্ন জাতি গঠন খাতে খরচের পরিমাণ দেখলেই বোঝা যাবে।

জন উন্নয়ন পরিকল্পনা (দুর্ভিক্ষ খাত, যেটা দুর্ভিক্ষ অঞ্চলের জন্যই ব্যয় করা হবে—তার মোট বরাদ্দ হচ্ছে ২৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, মোট রাজস্বের ·৯% ভাগ। যেখানে একমাত্র জয়নগর থানাতেই প্রায় ২লক্ষ অধিবাসী দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছেন মোট টাকা সেখানে ব্যয় করলেও জনপ্রতি ১৪ টাকার কিছু বেশী পড়বে। কিন্তু সারা পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানেই দুভিক্ষ প্রপীড়িত জনসংখ্যা ১ কোটির কম নয়। সেক্ষেত্রে জনপ্রতি কয়েক আনা খরচা হবে। এর পরেও যদি কেউ কংগ্রেসী উন্নয়নের প্রশংসা না করে, তাহলে তাদের জেলে পুরে রাখাই উচিৎ নয় কি? জনস্বাস্থ্য বিভাগে বরাদ্দ ১ কোটি ১০ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা মোট রাজস্বের শতকরা ৩·২ ভাগ। আবার এই টাকার ৬০% ভাগ খরচ হবে বড় বড় অফিসারদের পেছনে। ফলে আসল টাকার পরিমাণ আরো অনেক কমবে। যে দেশে ক্ষয় রোগ হু হু করে বেড়েই চলেছে, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে যেখানে ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ ক্রমবর্ধমান,

তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

★ নির্বাচনে বামপন্থী ঐক্য এবং পরবর্তী অবস্থা ★

ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গত সাধারণ নির্বাচন সত্যিই এক গুরুত্বপূর্ণ আসন গ্রহণ করেছে। প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার এবং এর বিপুলতাই শুধু মাত্র এই গুরুত্বের কারণ নহে—এই সাধারণ নির্বাচনের তাৎপর্য্য, এর রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতও এর জন্য অনেকখানি দায়ী। কংগ্রেসী সরকারী মহলের ভূমিকা যে গতানুগতিক প্রতিক্রিয়াশীলতা ও দণ্ডনীতির পথ বেয়ে চলবে—সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের স্বর্থের বিরুদ্ধে যে এর প্রতিটি কাজ পরিচালিত হবে এতে আর কোন সন্দেহই কারো ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন কংগ্রেস বিরোধী ও বামপন্থী দলসমূহ কি ভূমিকা গ্রহণ করবে সেটাই ছিল সবচেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয়—অগণিত জনসাধারণ তাই অনেকখানি আশা নিয়েই তাকিয়ে ছিল, পর্য্যালোচনা করেছিল বিভিন্ন দলের কার্য্যাবলী ও বিশেষ বিশেষ ভূমিকা।

নির্বাচনে যে ব্যাপক বামপন্থী ঐক্য গঠিত হয়নি এটা দেশবাসী মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু তবুও বামপন্থী ঐক্যের নামে যে সমস্ত প্রচেষ্টা এবং অবশেষে যে ধরনের মৈত্রী রূপ গ্রহণ করেছিল সেগুলো বিশদভাবে পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন ; বিশেষ করে নির্বাচনোত্তর যুগে সেই সমস্ত ঐক্যের পরিণতি ও অন্যান্য ঘটনার মাপকাটিতেই বিচার করতে হবে সেই বিগত দিনের কর্মপন্থার সঠিকতা।

বামপন্থী ঐক্য বিফল হবার অন্যতম কারণ বামপন্থী শক্তিসমূহের চরিত্র সম্পর্কে মতদ্বৈধতা। কিছু কিছু বামপন্থী দল বিশেষ ভাবে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি নির্বাচন ঐক্য প্রসঙ্গে কৃষকপ্রজা মজদুর দলকে বামপন্থী দল হিসেবে আখ্যা দিল। শুধু মাত্র "কংগ্রেসকে হারাতে হবে" এই ধ্বনি তুলে কংগ্রেসরই সমকক্ষ ধনিক পুঁজিপতি শ্রেণীর অন্য আর একটি দলকে বামপন্থী বলে আখ্যা দেওয়া যে বামপন্থী নীতি বিরোধী সে কথা পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার। নির্বাচনোত্তর যুগের এই দলের কার্য্যকলাপও সেই সাক্ষ্যই দেয়। এটা হ'ল নির্বাচন ঐক্য প্রসঙ্গের প্রথম স্তর। সেই স্তরও ব্যর্থ হ'ল শুধু মাত্র আসনের ভাগ বাটোয়ারার কলহ নিয়ে। তীব্র প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও শুধু মাত্র ঘৃণ্য সীটের" বখরা প্রথম স্তরের ঐক্যে আঘাত হানলো।

প্রথমে বোঝা দরকার যে যদিও এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'ল; কোন সুস্পষ্ট রূপই এটা গ্রহণ করেনি কিন্তু উক্ত দল (ক্ব,প্র,ম) সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট পার্টির মনোভাব আজও যে পরিবর্ত্তন হয়নি সেটা তখনকার তাদের বিবৃতি এবং আঞ্চলিকভাবে বিভিন্ন স্থানে ক্ব,প্র,ম, দলের সাথে কম্যুনিষ্ট পার্টির বামপন্থী (?) ঐক্য প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে। দ্বিতীয় স্তরের ঐক্য রূপ নিল U.S.O. Communist alliance এর মাধ্যমে। এই ইউ, এস, ও কম্যুনিষ্ট মৈত্রীকে আমাদের দেশে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হল। (তখনকার স্বাধীনতা পত্রিকার সম্পাদকীয় ও বিভিন্ন আলোচনা দ্রষ্টব্য) দল হিসেবে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার এই ঐক্যে অংশ গ্রহণ করেনি কতকগুলো গুঢ় নীতিগত পার্থক্যের জন্য। প্রথমতঃ এস, ইউ, সি, সেদিন সুষ্টভাবে ঘোষণা করেছিল যে কোন কর্মপন্থাবিহীন মৈত্রীকে আর যাই হোক গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট বলে ঘোষণা করা হয় উদ্দেশ্যমূলক প্রচার অথবা রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে U.S.O Communist মৈত্রী কোন কর্মপন্থার ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি শুধু মাত্র আসনের ভাগাভাগিই ছিল এর মূল ভিত্তি। নির্বাচন দ্বন্দে এইভাবে অগ্রসর হওয়ার ভেতর দিয়ে এই সমস্ত দল নির্বাচনকে কোন্ দৃষ্টি ভঙ্গীতে গ্রহণ করেছিল সেটাও স্পষ্ট বোঝা যায়। কত বেশী সংখ্যক আসন দখল করা যাবে এটাই ছিল এই সমস্ত দলের মূল লক্ষ্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে পরিস্কার বোঝা যায় যে নির্বাচনের মূল লক্ষ্য শুধু মাত্র আসন দখল করা নয়, মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনসাধারণকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করা, তাদের সংঘবদ্ধ করা এবং সাথে সাথে তাদের মূল রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ হিসাবে এই নির্বাচন দ্বন্দকে পরিচালিত করা। "কংগ্রেসকে হারাতে হবে" এসম্পর্কে কোন দ্বিধাই থাকতে পারে না, কিন্তু কেন হারাতে হবে, সেই প্রশ্নের পরিস্কার উত্তর এই আন্দোলনে প্রাধান্য লাভ করেনি। মূল কথা যে পুজিবাদী শোষন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই, এবং মূল আন্দোলনও যে সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং যেহেতু কংগ্রেস আজ ভারতবর্ষে সেই ধনবাদী ব্যবস্থাকেই টিকিয়ে রাখছে সেই জন্যই যে তার বিরুদ্ধে লড়াই একথা একমাত্র সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ছাড়া আর কোন দলই ঘোষনা করার সৎসাহস রাখেনি। তাই পুজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিরোধী হলেও কোন ধনিক শ্রেণীর দলের স্থান কোন প্রকারেই থাকতে পারে না।

শুধু তাই নয় এই কর্মপন্থা বিহীন ঐক্য যে নিতান্ত ক্ষনস্থায়ী, এটা যে শুধুমাত্র অনাক্রমন চুক্তি সে কথা এস, ইউ, সি, সাধারনভাবে ঘোষণা করেছে। এই চুক্তি যে অন্ততঃ বামপন্থী ঐক্য নয় এটা যে মূল শোষন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন আঘাতই হানতে পারে না এবং এই সমস্ত দল সমূহের ভেতর পরবর্ত্তীকালের বিরোধও যে অবশ্যম্ভাবী সে সম্পর্কে এস, ইউ, সি, আগে থেকেই জনসাধারনকে সাবধান করে দিয়েছে। সেই সাবধান বাণী আজ প্রতিটি অক্ষরে সত্য বলে প্রমানিত হয়েছে। আমাদের সেই ব্যখ্যার সঠিকতা একটু বিশদ আলোচনা করলেই বোঝা যাবে।

প্রথমতঃ কৃষক প্রজা মজদুর দল যে বামপন্থী দল নয় কিংবা "প্রগতিশীল ধনিক শ্রেনীর" প্রতিনিধি নয় তার পরিস্কার প্রমান পাওয়া যাচ্ছে এই দলের বর্তমানে সোস্যালিষ্ট পার্টির সাথে আঁতাত এবং মিলন প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে। সোস্যালিষ্ট পার্টিকে কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং অন্যান্য বামপন্থী দল সমূহ অনেকেই আখ্যা দিয়া থাকেন কংগ্রেসের সমকক্ষ ধনিক শ্রেণীর দল, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধবাজ অনুচর হিসেবে। এহেন প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিনপন্থী গনতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী দলের সাথে কৃষক প্রজা মজদুর দলের এই স্বাভাবিক মিলনে পরবর্ত্তী দলের চরিত্র সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশই থাকতে পারে না। ক্ব-প্র-ম-দল সম্পর্কে আমাদের কর্ত্তব্য আজ বাস্তব অভিজ্ঞতার মাপকাটিতেই প্রমান হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে জনসাধারন সাধারন নির্বাচনে অংশ গ্রহন করেছিল শুধুমাত্র রাজনৈতিক শিক্ষা, সচেতন ও আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে ধারনার অভাব এবং সাথে সাথে আইনসভাসমূহে কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য জনসাধারনের মনে এক বিরাট নিরাশার সঞ্চার করেছে। এর প্রতিক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই এক আন্দোলন বিমুখতার ভাব সৃষ্টি করেছে।

তৃতীয়তঃ যে সমস্ত দল তখন কম্যুনিষ্ট পার্টির সাথে মৈত্রী স্থাপন করে ছিল তারা আজ প্রায় সকলেই কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন আন্দোলন পরিচালনার কথা চিন্তা করছেন। এর প্রতিফলন আইনসভা থেকে শুরু করে প্রতিটি জায়গায় দেখা যাচ্ছে। যে ঐক্যের জয়গান করে এই সমস্ত দল নির্বাচনী বৈতরনী পার হয়েছেন এবং কম্যুনিষ্ট পার্টিও যেভাবে শুবুমাত্র দলীয় স্বার্থে এই ঐক্যের ডামাডোল বাজিয়ে নির্বাচনের বাজার মাৎ করার চেষ্টা করেছেন সেই ঐক্যের যে কোন দৃঢ় ভিত্তিই ছিল না, সেটা যে জনসাধারনকে পরোক্ষভাবে বিপথে পরিচালিত করেছে এই শিক্ষা জনসাধারনের বিশেষভাবে গ্রহন করা উচিত। তথাকথিত বামপন্থীর ঐক্যের এই পরিনতি অন্যদিকে জনসাধারনের মনে হতাশা সৃষ্টি করেছে এবং "বামপন্থী ঐক্য ভূয়ো কথা" কংগ্রেসী সরকার ও শ্রীনেহেরুর এই অপপ্রচারকেও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে।

নির্বাচনের পরবর্ত্তী যুগে এই সমস্ত শিক্ষা দিয়েই আমাদের এগুতে হবে। বিগত দিনের কুৎসিত অভিজ্ঞতা যেন আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

ভারতীয় মেহন্নতী জনসাধারনের মূল লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্ততন্ত্রবাদ, পুজিবাদ নহে" এই কর্মপন্থা গ্রহনের মারফৎ কম্যুনিষ্ট পার্টি যে এক সংস্কার বাদী বেড়াজাল সৃষ্টি করছে এবং আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটা যে অনেকাংশে দক্ষিনপন্থী গনতান্ত্রিক সমাজবাদের (Right wing social Democratism) সমতুল্য সে সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই! কিন্তু তবুও আন্দোলনের শক্তি হিসেবে কম্যুনিষ্ট পার্টি একটি বামপন্থী শক্তি এটাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সোস্যালিষ্ট পার্টি এবং ক্ব, প্র, ম, দলের কিছুটা বিরোধী ভূমিকা থাকা সত্বেও এরা বামপন্থী শক্তি হিসেবে পরিগনিত হতে পারে না। এই সমস্ত শক্তি বরঞ্চ বিভিন্ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিপ্লব বিরোধীতার ভূমিকাই গ্রহণ করেছে। তাই অন্যান্য যে সমস্ত বামপন্থী দল ফরোয়ার্ডব্লক মার্ক্সিষ্ট, আর, এস, পি, প্রভৃতি দলসমূহ আজ কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বাদ দিয়ে সমস্ত বামপন্থী ও বামপন্থী মুখোসধারী শক্তিসমূহের যে ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট গঠন করার চেষ্টা করেছে সেটাও পুরোপুরিভাবে সাফল্য লাভ করতে পারে না—এতে সোস্যালিষ্ট পার্টি প্রভৃতি দলের নেতৃত্বকে পুনরায় প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দেওয়া হবে। সাথে সাথে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে ও কর্ম্মীদের কাছে আমাদের আবেদন যে সঙ্কীর্ণ মনোভাব বিসর্জন দিয়ে তারা যেন সত্যিই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে এগিয়ে আসেন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ফাটল না ধরান।

আজকের এই যুগ সন্ধিক্ষনে এস, ইউ সি সারা দেশজোড়া ঐক্যবদ্ধ গনতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গঠনের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করছে এর জন্য প্রয়োজন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্রবাদ, ও পুজিবাদী শোষন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমস্ত সত্যিকারের বামপন্থী দলসমূহের নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে একটি ব্যাপক সংগঠন তৈরী করা। এই সংগঠনের উদ্যোগেই এবং নেতৃত্বেই দেশের সমস্ত গনতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করা বিশেষ প্রয়োজন। এই আন্দোলনের শক্তি সঞ্চয়ের ওপরই নির্ভর করছে ভবিষ্যত আন্দোলনের চেহারা এবং আগামী বিপ্লবের সম্ভাবনা। তাই সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার সমস্ত বামপন্থীদলসমূহকে ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট গঠনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানাচ্ছে।

"রক্তশোষণ" বাজেট জনসাধারণের কোন উন্নতি আনতে পারে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সেক্ষেত্রে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখাই সরকারের বিশেষ কর্তব্য। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী অমৃত কাউরও একথা অস্বীকার করতে পারেন নি। এর পরেও যদি জনস্বাস্থ্যের প্রতি কোন নজর না দেওয়া হয় তবে এটাকে অমানুষিক অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। বিশেষ করে দুর্ভিক্ষের মুখে জনসাধারণের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাওয়াই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে বর্তমান বাজেটের জনস্বাস্থ্যের দিকটিকে কোনমতেই সমর্থন করা যায় না।

শিল্পোন্নতির দিকে তাকালে আরো চমৎকার অবস্থা দেখা যাবে। যে শিল্পের ওপর নির্ভর করছে জাতির ভবিষ্যৎ, যে শিল্পোন্নতিই বেকার সমস্যাকে সমাধান করতে পারে, সেই শিল্পখাতে বরাদ্দ হয়েছে মোট রাজস্বের ১·৫% ভাগ। এতে টাকার পরিমাণ হল ৩৭ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। কংগ্রেসী সরকার ক্ষমতা লাভের পর খুব জোর গলায় প্রচার করেছিলেন যে জাতীয় শিল্প বৃদ্ধির জন্য সরকার সমস্ত ব্যবস্থাই অবলম্বন করবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির আজ কোন মূল্যই নেই। টাটা-বিড়লা গোষ্ঠির স্বার্থের খাতিরে এখনও মূল শিল্প-জাতীয় করণের কোন প্রশ্নই সরকার উত্থাপন করছে না, বরঞ্চ নির্বিবাদে ব্যক্তিগত শোষণ চালাবার সমস্ত সুযোগকেই প্রশস্ত করা হচ্ছে। বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্ত করার ব্যাপারেও সেই একই নীতি কাজ করছে—জনসাধারণের রক্ত জল করে মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর মুনাফার পাহাড় সৃষ্টি করা হচ্ছে।

ডাঃ বিধান রায় খুব বড়াই করে বলেছেন যে শিক্ষা খাতে এবার খরচ বাড়ানো হয়েছে। এই বাড়ানোটাও কেমন একটু বিচার করা যাক্। মোট রাজস্বের ১৩·৬% ভাগ শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে। দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবাংলায় খুব স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষাক্ষেত্রে এক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। অন্যান্য প্রদেশের সাথে তুলনা করলেই এই দম্ভোক্তির অসারতা ধরা পড়বে। কংগ্রেসী আমলে বোম্বাই এবং মাদ্রজে যেখানে মোট রাজস্বের ২০% ভাগ খরচ হয় সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ১৩·৬% ভাগ অত্যন্ত নগন্যই বলতে হবে। এখনও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়নি—কোন চেষ্টাও নেই এর পেছনে। শুধু বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণকে কিছুদিনের জন্য ভোলান গেলেও বরাবর এটা সম্ভব নয়।

পশ্চিমবঙ্গের আর একটি মূল সমস্যা—বাস্তুহারা সমস্যাকে বাজেটে প্রায় কোন আমলই দেওয়া হয়নি। যেখানে সরকারী হিসেবমতই প্রায় ৬০ লক্ষ বাস্তুহারা পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন সেক্ষেত্রে মোট রাজস্বের ১·১% ভাগ অর্থাৎ ৩৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা এই খাতে বরাদ্দ হয়েছে। হিসেব করলে আট আনার কিছু বেশী গিয়ে পড়বে। দেশ বিভাগের পূর্বে যে আশ্বাস তখনকার পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠদের দেওয়া হয়েছিল এই বাজেট কি তারই অভিব্যক্তি? গরীব বাস্তুহারা জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা হচ্ছে।

অবশ্য একটা কথা লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে কৌশলী মুখ্যমন্ত্রী বাজেটের উন্নয়নের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছেন। সেই ফিরিস্তিতে রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা, হরিঘোটা পরিকল্পনা, কল্যাণী শহর নির্মাণ, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, সরকারী যানবাহন ব্যবস্থা ইত্যাদিকে পঞ্চমুখে প্রংশসা করেছেন। পরিকল্পনার প্রয়োজনকে কেহ অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু পরিকল্পনা যদি সেই পর্য্যায়েই থাকে, এর যদি কোন ব্যবহারিক প্রয়োগই না হয়, কিংবা যদি এ সমস্ত পরিকল্পনা জনসাধারণের জীবনধারণের মানকে উন্নত করতে কোন সাহায্যই না করে, তবে সেই সমস্ত প্রশংসার্হ পরিকল্পনা জনসাধারণের কাছে "অশ্বডিম্বের"ই সমান। পরিকল্পনার পিছনে যেভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করা হচ্ছে সেটা যদি কার্য্য ক্ষেত্রে ব্যয় করা হত তাহলেও অনেক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যেত। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই সমস্ত পরিকল্পনা শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্য্যবশিত হয়েছে।

সুতরাং বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এই বাজেটের মূল উদ্দেশ্য জনস্বার্থকে প্রতিষ্ঠা করা নয়, জনস্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে নিজেদের পকেট বোঝাই করা। এই বাজেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাস্তুহারার কথা স্থান লাভ করেনি, স্থান লাভ করেছে পুলিশী এণ্ডারসনীয় শাসন, চোরাকারবারী ব্যবস্থা, স্বজন পোষণ ও সমস্ত রকমের দুর্নীতি। এই বাজেট জনতার নয়—চোরাকারবারী ও মুনাফাখোরদের বাজেট। এই "রক্ত শোষণ" বাজেট মেহন্নতী জনসাধারণের কোন উন্নতিই আনতে পারে না। এ-ধরণের বাজেটকে নাকচ করার ভিতরেই মুক্তির পথ প্রশস্ত হতে পারে। যতদিন এই পুঁজিবাদী সরকার ও পুলিশী বাজেট বর্তমান ততদিন জনসাধারণের কোন সুখই আসতে পারে না। তাই এই সরকারের বিরুদ্ধে, এই শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের পথে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিটি অঞ্চলে এই আন্দোলনকেই জোরদার করুণ, সংগঠনকে এমন শক্তিশালী করুন যাতে চূড়ান্ত আঘাত দিয়ে সমস্ত শোষণকে ধূলিস্মাৎ করে সত্যিকারের জনস্বার্থ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। এটাই একমাত্র পথ—এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার এপথে এগিয়ে আসতেই আহ্বান জানাচ্ছে।

ভারতীয় নাবিকদের শোচনীয় দুরবস্থা প্রতিবাদে অবস্থান ধর্ম্মঘট পালন কর

তথাকথিত সাধারণ তান্ত্রিক ভারতবর্ষ ভারতীয় নৌবাহিনীর নাবিকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোন পরিবর্ত্তনই আনিতে পারে নাই। সংবাদে প্রকাশ যে বর্ত্তমানে তাহাদের যে ধরনের খাবার দেওয়া হয় সেটা মানুষের খাইবার পক্ষে অনুপযোগী। শুধু তাই নয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য মান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলেও তাহাদের উপার্জন বিন্দুমাত্র বাড়ে নাই; কেহই হয়তো বিশ্বাস করিবেনা যে তাহারা প্রতি মাসে পরিবার ভাতা (family allowance) এক টাকা করিয়া পায়।

উপরন্তু উচ্চপদস্থ অফিসারদের ব্যবহার অত্যন্ত ঘৃন্য এবং অপমান কর। জাহাজে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত বড় অফিসারগণ যদিও মদ্যপান নাচ এবং আমোদ-আলহাদের সুযোগ পান সাধারণ নাবিকগনকে রাত্রি ১০ টার পর এমনকি ধূমপান করিতেও দেওয়া হয় না।

এই ক্রমবর্দ্ধমান অত্যাচারের ফলে জাহাজের কর্মীরা সংঘবদ্ধ হইতেছেন এবং গত ৭ই মে তাহারা কাজ করিতে অস্বীকার করেন এবং সাফল্য মণ্ডিত ধর্মঘট হয়। সরকার এবং কর্তৃপক্ষ জাতীয় স্বার্থের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকে অবহেলা করিলে ভবিষ্যতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা আছে।

বিহার প্রাদেশিক রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই জুলাই অনুষ্ঠিত হইবার সিদ্ধান্ত।

আগামী ১৩ই, ১৪ই, ও ১৫ই জুলাই ঘাটশিলায় বিহার প্রাদেশিক রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হইবে। এখানে বিহার প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় কর্মী ও সমর্থকগণ যোগদান করিবেন। এই শিক্ষা-শিবিরে এস, ইউ, সির সাধারন সম্পাদ কমরেড শিবদাস ঘোষ, কমরেড সুবো ব্যানার্জি, কমরেড নীহার মুখার্জি, কমরেড প্রীতিশচন্দ, প্রভৃতি কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যবৃন্দ যোগদান করিবেন। এই উপলক্ষে ১৩ই জুলাই ঘাটশিলায় এক বিরাট জনসমাবেশ হইবে।

খাদ্যের দাবীতে পশ্চিমবঙ্গ সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সম্মেলন

● আন্দোলনের ভিত্তি হিসাবে ১৪ দফা দাবী গৃহীত ●

গত ৩০শে জুন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে, সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে খাদ্য আন্দোলনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এক সম্মেলন হয়। সম্মেলনে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তিন শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কিদোয়াই প্রস্তাবের দুর্বলতাকে সমালোচনা করে দেশের খাদ্যাভাবকে চিরস্থায়ীরূপে তাকে দূর করার জন্য এক সক্রিয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলসমূহকে দুর্ভিক্ষ অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা, সমস্ত স্থানে পূর্ণ রেশন ব্যবস্থা চালু করা, জমিদার, জোতদার, চোরাকারবারী গোষ্ঠীর কাছ থেকে খাদ্য শস্য বাজেয়াপ্ত করাও খামখেয়ালী খাদ্য সংগ্রহনীতি বর্জন ক'রে "গণ কমিটির" অনুমোদনে খাদ্য সংগ্রহ করা প্রভৃতি ১০ দফা স্বল্প মেয়াদী দাবী এবং বিনা খেশারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, চাষীর হাতে জমি বণ্টন, পতিত জমিতে চাষের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি ৪ দফা দীর্ঘ মেয়াদী দাবী গৃহীত হয়।

সম্মেলনে হেমন্ত বসু, সুবোধ ব্যানার্জি, জ্যোতিষ জোয়ারদার, সুধা রায় প্রভৃতি বামপন্থী নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করেন।

খাদ্যের দাবীতে এসেম্বলী অভিমুখে বিরাট মিছিল

এস, ইউ, সি ও ক্ষেত মজুর ফেডারেশনের নেতৃত্বে হাজার ★ হাজার ভুখা চাষীর সমাবেশ ★

গত ২৩শে জুন সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি এসেম্বলী অভিমুখে ভুখা মিছিল পরিচালনার আহ্বান জানিয়েছিল। সেই আহ্বানে কলিকাতা মহানগরীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অসংখ্য শোভাযাত্রা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জমায়েৎ হয়। বিভিন্ন দলের পতাকা ও ফেষ্টুনের সমাবেশে এই জমায়েৎটি বিশেষভাবে সুদৃশ্য মনে হয়। এই মিছিলে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার ও ক্ষেত মজুর ফেডারেশনের নেতৃত্বে দক্ষিন চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় দুই হাজার ভুখা চাষী যোগ দেয়। দূর গ্রামাঞ্চল থেকে কৃষকদের এই অভিযান কলকাতার রাজপথে এক নতুন প্রানের সঞ্চার করে। এই মিছিলটি ঢোকার সাথে সাথে স্বেচ্ছাসেবকগণ এই বিরাট মিছিলটিকে আয়ত্তে আনতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেকক্ষন পরে সুসংঘবদ্ধ ভাবে দাড়াবার পর এই বিরাট মিছিল তাদের বাঁচার দাবী জানাতে দাম্ভিক কংগ্রেসী সরকারের এসেম্বলীর দিকে রওনা হয়। "ইনক্লাব জিন্দাবাদ", "সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি—জিন্দাবাদ" "জমিদারী প্রথার—উচ্ছেদ চাই" "কৃষি ঋণ—দিতে হবে" "জয়নগর ও ২৪ পরগনা অঞ্চলকে দুর্ভিক্ষ এলাকা—ঘোষনা কর" "দুর্ভিক্ষ এলাকায়—খাদ্য চাই" "বাঁচার মত—রেশন চাই" ইত্যাদি ধনিতে ধর্মতলা, এসপ্লানেড প্রভৃতি অঞ্চল মুখরিত হয় পড়ে। সাধারনভাবে এই বিরাট মিছিল এবং বিশেষভাবে চাষী মিছিল সকলকেই অভিভূত করে। এস্‌প্লানেড পার হয়ে এই মিছিল এসেম্বলীতে এসে পৌছলে এই মিছিল দেখবার জন্যও অসংখ্য দর্শকের সমাবেশ হয়। বাইরে এই মিছিল আসার সাথে সাথে আইন সভার ভিতরে বিরোধী সদস্যদের ভিতরে এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের নেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জি বারবার ডাঃ বিধান রায়কে এই ভুখা মিছিলের সাথে সাক্ষাৎ করবার দাবী জানান। এই দাবী ডাঃ রায় পালন না করায় কমরেড ব্যানার্জি এক মুলতবী প্রস্তাব পেশ করেন। স্পীকার তথা কথিত নিয়মকানুনের প্রশ্নে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। এমতাবস্থায় কমরেড ব্যানার্জি এই সমস্ত নিয়মের অসারতা দেখিয়ে বলেন যে যখন জনতা পরিষদের বাইরে তাদের দাবী জানায় তখন এই ধরনের ভূয়ো নিয়মতান্ত্রিকতার কোন মানে নেই। এই বলে তিনি পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেন এবং তাঁর সাথে অন্যান্য বিরোধী সদস্যেরাও যোগ দেন। এই সময় স্পীকার ১৫ মিনিটের জন্য অধিবেশন মুলতবি রাখতে বাধ্য হন।

অধিবেশনের শেষে আইন সভার সমস্ত গেটই শোভাযাত্রীদের দ্বারা বন্ধ দেখে দাম্ভিক কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী পুলিশের সাহায্যে একটি গেটে নির্মম লাঠি চার্জ ও যতীন চক্রবর্ত্তী, মাখন পাল প্রমুখ নেতাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিজেদের বের হবার পথকে প্রশস্ত করেন।

মন্ত্রিমণ্ডলী ও কংগ্রেসী সদস্যদের পলায়নের পর আবার এই মিছিল গন্তব্য স্থানের দিকে রওনা হয়। ভুখা চাষী মিছিলটি ধর্মতলা ওয়েলিংটন, বহুবাজার দিয়ে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছে। সেখানে কংগ্রেসী সরকারের ভাড়াটে পুলিশ আক্রমনের জন্য অপেক্ষা করছিল। "টিকিট নেই" এই অজুহাতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পুলিশ বর্ব্বরোচিত লাঠি চার্জ করে এবং কমরেড সন্তোষ ভট্টাচার্য, অবনী কর্মকার প্রমুখ কর্মী সহ ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে। এই লাঠি চালনায় অনেকেই আহত হন, কয়েকজন গুরুতর ভাবেই আহত হন। এঅবস্থায় কমরেড সুবোধ ব্যানার্জি, হেমন্ত বসু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে ধৃত ব্যক্তিগন জামিনে খালাস পান এবং আহত ব্যক্তিদের শুশ্রুষার ব্যবস্থা হয়।

★ ত্রুটি স্বীকার ★

বহুদিন পরে "গণদাবী" আবার আত্মপ্রকাশ করল। "গণদাবী"র অর্থনৈতিক সঙ্কটই তার এতদিনকার মৌনতার একমাত্র কারন। পাঠকবর্গের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এই সঙ্কট কিছুটা কাটিয়ে উঠে কাগজ পুনঃ প্রকাশ সম্ভব হল বটে কিন্তু তার আধারকে ব্যহত না ক'রে পারা গেলনা। আট পৃষ্ঠার পরিবর্ত্তে "গণদাবী" এখন থেকে চার পৃষ্ঠা করে বের হবে এবং দামও দুই আনার পরিবর্ত্তে এক আনা করে ধার্য্য হয়েছে। "গণদাবী"র দাবীকে অপ্রতিহত গতিতে চালানর জন্য পাঠকবর্গ ও জনসাধারণের কাছে আবেদন যে তাঁরা যেন নিয়মিতভাবে আর্থিক সাহায্য পাঠিয়ে "গণদাবী"কে অচিরেই স্বয়ং সম্পূর্ণ ও সম্পূর্ণাঙ্গ ক'রে তাদের দৈনন্দিণ আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেন।

নিবেদক
ম্যানেজার, গণদাবী

খাদ্য দাবী দিবস উপলক্ষে ময়দানে ★ বিরাট সভা ★

গত ৬ই জুলাই সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটীর উদ্যোগে মনুমেন্টের নীচে 'খাদ্য দাবী দিবস' উপলক্ষ্যে একটী বিরাট জনসমাবেশ হয়। কলিকাতার বিভিন্ন এলাকা হতে কয়েকটী শোভাযাত্রা ঐ সভায় যোগদান করে। বিভাবতী বসু উক্ত সভায় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।

কৃষক প্রজা দলের নেতা ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন "সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটীর তরফ হতে গতকাল একটী প্রতিনিধি দল ডাঃ বিধান রায়ের নিকট সঃ দুঃ প্রঃ কমিটীর গত সম্মেলনে গৃহীত দাবীগুলি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গিয়াছিল। ডাঃ বিধান রায় ঐ দাবীগুলির যুক্তিযুক্ততা মুখে স্বীকার করলেও কার্য্যতঃ কিছু করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয় বলে জানান"।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটী সেন্টারের নেতা কমরেড নীহার মুখার্জি বলেন "জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ছাড়া খাদ্য সমস্যার কার্য্যতঃ সমাধান হতে পারে না। সঃ দুঃ প্রঃ কমিটীর দাবী আদায় করতে হলে তীব্র গণ-আন্দোলন একমাত্র পথ। তিনি জনসাধারণকে সেই পথেই অগ্রসর হতে আহ্বান জানান"।

সভানেত্রী তাঁর ভাষণে বলেন "যে সরকার দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধানে অক্ষম, সে সরকারের গদী আকড়ে থাকার কোনও অধিকার নাই। জনসাধারণ যেখানে খাদ্যাভাবে প্রপীড়িত সেখানে মন্ত্রীদের মোটা বেতনের বিল পাশ করা একটী তাজ্জব ব্যাপার"।

সভায় বিশ্বনাথ দুবে (বলশেভিক পার্টি), নরেন দাস (সোস্যালিষ্ট পার্টি), বারিন ঘোষ (আর, সি, পি, আই), যতীন চক্রবর্ত্তী (আর, এস, পি,), সত্য গুপ্ত (বি, ভি,), নানু ঘোষ (ফরোয়ার্ড ব্লক মার্ক্সিষ্ট), সুনীল দাস (ফরোয়ার্ড ব্লক) প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

পশ্চিম বংগের বর্তমান আইন সভা

বিগত সাধারণ নির্বাচনের ফলে পশ্চিম বাংলায় যে নতুন বিধান সভা গঠিত হয়েছে তা গত ১৮ই জুন সভ্যদের শপথ গ্রহণের পর আনুষ্ঠানিকভাবে কার্য্যকরী হয়েছে। এই বিধান সভায় সভ্যসংখ্যা এবার ২৩৮। কংগ্রেস দল কর্তৃক সরকারী ক্ষমতার পূর্ণ যথেচ্ছাচারের মারফত এবং বিভিন্ন বামপন্থী দল গুলোর অনৈক্য ও কোন কোন ক্ষেত্রে গোঁজামিল দিয়ে গড়া তথাকথিত ঐক্য এবং কিছু দলের সুবিধাবাদের মধ্যে দিয়ে সাধারণ নির্বাচন সমাধা হয়। এর ফলে কংগ্রেস মোটামুটি দেড় শতাধিক আসন পেয়ে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করেছে। বিভিন্ন বামপন্থী দল এবং স্বতন্ত্র, জনসংগ, হিন্দুমহাসভা, কে, এম, পি, প্রভৃতিকে নিয়ে কংগ্রেস-বিরোধীদের মোট শক্তি মোটামুটি ৮০।৯০ এর কাছাকাছি। বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে থেকে পরিষদে আছেন কম্যুনিষ্ট পার্টি, সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার, ফরওয়ার্ডব্লক (মার্ক্সঃ) ও (সুভাষঃ ও এস, আর' পি'র প্রতিনিধি।

২০ জুন প্রদেশপালের ভাষণের পর ২১ জুন থেকে পরিষদে আইন প্রণয়ণের কাজ সুরু হয়। বলা বাহুল্য সংখ্যার দিক দিয়ে কংগ্রেস দল তার নীরব আজ্ঞাবাহী গরিষ্ঠতার জোরে যে কোন শোষণ ও স্বৈরাচারমূলক আইন চালু করিয়ে নেবে এবং নিচ্ছেও। তবু, বিরোধী পক্ষের প্রবল প্রতিরোধ তাকে পদে পদে নাজেহাল করছে ও তার ঘৃন্য স্বরূপ জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করে দিচ্ছে।

মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, প্রভৃতি নিয়ে মন্ত্রীসভার অংশীদার ৩০ জন। খণ্ডিত, একতৃতীয়াংশ বাংলার বুকে এই বিপুল শাসকদল যে ভাবে লুটের মাল ভাগের বন্দোবস্ত করছে তা ডাঃ বিধান রায়ের প্রাণপণ ওকালতি সত্বেও, জনতার বুঝতে একবিন্দু অসুবিধা হ'চ্ছে না। আইন সভায় প্রথমেই সরকার-দল তাড়াহুড়া ক'রে মন্ত্রীদের মাহিনা ও মাসোহারা সংক্রান্ত নির্লজ্জ দাবী দাওয়া পাশ করিয়ে নিয়েছে। অবশ্য বিরোধীপক্ষের নির্মম আক্রমনে তার কিছুটা অংগচ্ছদ করতে হ'য়েছে।

বিরোধীপক্ষের অনেকেই আইন সভায় নবাগত, কিন্তু তাঁদের কর্মনৈপুন্য এরমধ্যেই সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। বিশেষ করে এস, ইউ, সি প্রতিনিধি কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর নাম নিঃসংকোচেই সব্রাগ্রগণ্য বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি তাঁর নির্মম সমালোচনার কশাঘাতে যেভাবে সরকারপক্ষকে জর্জ্জরিত করে তুলেছেন ও দৃপ্ত বাগ্মীতায় তার নির্লজ্জ স্বৈরাচারী চরিত্র উদ্‌ঘাটন করে দিচ্ছেন, তা এই অত্যল্প কালের মধ্যেই সাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জ্জন করেছে অন্যান্যদের মধ্যে ডাঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জী শ্রীচারুভাণ্ডারী, শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীহরিপদ চ্যাটার্জী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

২৯শে জুলাই গনদাবী দিবস ★ পালন করুন ★

আগামী ২৯শে জুলাই গনদাবীর পঞ্চম বার্ষিকী প্রতিষ্ঠা দিবস। এই দিবসকে যথাযথভাবে পালনের উদ্দেশ্যে সমস্ত জিলা ও ইউনিট সমূহকে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। এই দিবসের তাৎপর্য্য, এর গুরুত্বকে জনসাধারনের সামনে উপস্থিত করিয়া তাদের সকলকে গনদাবীর আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করাই এই দিবসের সার্থকতা। যে অর্থনৈতিক সঙ্কট গনদাবীর অপ্রতিহত গতিকে বারবার ব্যাহত করছে সেই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য যাতে প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকরী প্রচেষ্টা করা হয় সেটা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই উপলক্ষে পাঠক ও জনসাধারনের কাছ থেকে "গনদাবী তহবিলে" অর্থ সংগ্রহ করুন, একে বলিষ্ঠ করুন।

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক পরিবেষক প্রেস, ২৩ ডিক্‌সন লেন, হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।